পুরাতনী

# মহিলাদের চোখে দুর্গাপুজো

চিত্রা দেব

বাঙালি-জীবনে দুর্গোৎসব নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ উৎসব। এক সময়ে আমাদের ঘরে ঘরে ছিল বারো মাসে তেরো পার্বণ। প্রতি মাসেই এক বা একাধিক দেবতার আরাধনা হত। পুরোহিত মশাই পুজোয় বসতেন, বাকি সব কাজ করতেন মেয়েরা। ব্রত-পার্বণে তো পুরোহিতেরও প্রয়োজন হত না। কিন্তু দুর্গাপূজা হচ্ছে মহাপূজা। শাস্ত্রে আছে, ষোড়শোপচারে পূজার সঙ্গে মহাস্নান, বলি আর হোম থাকলে সে-পূজা মহাপূজারূপে গণ্য হবে। এত সমারোহ অন্দরমহলে হবে কী করে? তাই দুর্গাপুজো ছিল বাহিরমহলের উৎসব। পুজো হত বাবুদের বাড়ির ঠাকুরদালানে। সেই উপলক্ষ্যে তাঁরা পোষা পায়রার মতো টাকা ওড়াতেন আর 'বাবু' নাম কিনে বড় তৃপ্তি পেতেন। বাড়ির ছোট-বড় পোষ্য-কর্মচারী সকলের জন্য নতুন পোশাক আসত। অন্তঃপুরিকারাও বঞ্চিত হতেন না, পেতেন কয়েক প্রস্থ শাড়ি, গয়না, প্রসাধনী, সুগন্ধি। দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে তাঁদের কী ভূমিকা ছিল জানা যাবে না? তাও কি হয়? খুঁজে বেড়াই মহিলাদের স্মৃতিকথায়, আত্মজীবনীতে।

দেবী দুর্গা নারীমূর্তি তো কী, বারবাড়িতে গিয়ে দুর্গাদর্শনের অনুমতি কোথাও কোথাও মেয়েরা পেতেন শুধু ভাসানের দিন! অথচ প্রদীপের সলতে পাকানো থেকে ভোগরান্না—সব কাজেই অনলস হাত তাঁদের। নিবোধত-র জন্য একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্গাপুজোর ইতিহাস-পরিক্রমা সেরে ফেললেন বিখ্যাত গবেষিকা-লেখিকা চিত্রা দেব।

প্রথম আত্মজীবনী-রচয়িত্রী রাসসুন্দরী দেবী কিছু না লিখলেও তাঁর পৌত্রী সরলাবালা সরকার শৈশবস্মৃতি উদ্ধার করে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের পুজোর কথায় লিখেছেন, ''বাড়ির মেয়েরা সকলেই মহাষ্টমীর উপবাস করিতেন। মাঝে মাঝে পূজার অষ্টমীর দিন সন্ধিপূজা মধ্যরাত্রে অথবা তাহার পরেও শেষ হইত। সন্ধিপূজা শেষ হইলে রাজবাড়িতে তোপ পড়িত। তোপের শব্দ শুনিয়া উপবাসকারিণীরা জলগ্রহণ করিতেন।''

এ-ছবি শহরে-গ্রামে ধনীর গৃহে, গরিবের কুটিরে সর্বত্র দেখা যেত। সরলাবালা লিখেছেন তাঁর বালিকা বয়সের কথা, ১৮৮০-৯০ সালের কোনও এক সময়ের কথা। কৃষ্ণনগরের ''রাজবাড়ির দেবীপ্রতিমার নাম ছিল রাজরাজেশ্বরী, হিরা-মুক্তার গহনা দিয়া তাঁহাকে সাজানো হইত।'' অন্যত্র লিখেছেন, ''সেই প্রতিমার হাতের ও গায়ের মাপের সোনার ও জড়োয়া গহনা ছিল খিলেন করা; খিলেনের খিল খুলে পুরোহিত এসে গহনা পরাতেন মাকে, অপরূপ সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্তি।'' সেকালে তাঁরা দুর্গাপ্রতিমা দেখতেন বা দেখতে পেতেন প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন। ''ভাসানের দিন আমরা গোয়াড়ি গিয়া এক উকিলবাবুর রাস্তার ধারের বাড়ির ছাদ হইতে ঠাকুর দেখিতাম।'' আর একটি খবর দিয়েছেন তিনি, ''সপ্তমীতে সাত তরকারি, অষ্টমীতে আট তরকারি, নবমীতে নয় তরকারি রাঁধার নিয়ম ছিল।'' এ-নিয়মের কথা অন্যরা কেউ লেখেননি।

বাড়ির ছাদে উঠে প্রতিমা দর্শনের কথা কলকাতার মেয়েরাও লিখেছেন। সময়ের দিক থেকে অনেক আগে ঠাকুরবাড়ির মেয়ে সৌদামিনী দেবী লিখেছিলেন, ''আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নূতন পোষাক পরিয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত—আমরা মেয়েরা সেইদিন তেতলার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেখিতাম। তখন বৎসরের মধ্যে সেই একদিন আমরা তেতলার ছাদে উঠিবার স্বাধীনতা পাইতাম।'' এসময় সৌদামিনীর বয়স সরলাবালার মতোই হবে, বছর দশ-এগারো। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ১৮৫৮ সালে।

শহরে না হলেও গ্রামাঞ্চলে দুর্গাপুজোয় মেয়েরা কিছু কিছু কাজকর্ম করতেন, তবে প্রতিমাকে ঘিরে নয়, ভোগরান্নার কাজে। ঘরোয়া পুজোর ছোটখাট অনুষ্ঠানে তাঁদের যে-ভূমিকা থাকত, দুর্গাপুজোয় তা সম্ভব হত না বহুদিন পর্যন্ত। যেখানে পর্দার কড়াকড়ি চোখে পড়ার মতো ছিল না সেখানেও মেয়েরা পুজোর কদিন আড়ালেই থাকতেন। গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি' উপন্যাসের শিবসুন্দরী বলেছিলেন, ''বারো মাস ঘরবার করি বলে কি পুজো দিনে বারমহলে যাব? লোকে কইবে কি? আমি যে মহেশের মা, আমার জমিদার ছেলের কত মান খাতির। আমার কি হারানি-বাড়ানির মতন বেলতলায় যাওয়া চলে?'' সেজন্য মণ্ডপের দক্ষিণে বেলতলায় বেদি লেপে বোধনের আয়োজন শুরু হলেও বাড়ির মেয়েদের সেখানে দেখা যায় না। 'রায়বাড়ি' আত্মজৈবনিক উপন্যাস, একদিন গিরিবালা নিজে যে-জীবন যাপন করেছিলেন তারই নিখুঁত এবং নির্ভরযোগ্য চিত্র এখানে পাওয়া যাবে। তবে তিনি যে-সময়ের কথা লিখছেন তখন পুজোমণ্ডপে মেয়েরা যেতেন না তা নয়, বিশেষ করে পল্লি অঞ্চলে, যেখানে সবার বাড়িতে পুজো হত না, তাঁরা যেতেন জমিদারবাড়িতে। 'রায়বাড়ি' উপন্যাসে পুজোর বৈশিষ্ট্য হল, এ নারীর চোখে দেখা দুর্গাপুজো। মাসখানেক অবিশ্রাম কাজের মধ্যে ডুবে থেকে তাঁরা পুজো দেখছেন, পুজোর কাজ করছেন। গিরিবালা লিখেছেন, ''মণ্ডপের এক পাশে গালিচা পাতিয়া মেয়েদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে। পাড়ার মেয়েরা দলে দলে আসিয়া আসন

লইয়াছে। মনোরমা তাহাদের পিছনে বিনুকে বসাইয়া দিলেন, সামনে বসিলে লোকে দেখিলে নিন্দা করিবে।" কারণ বিনু জমিদারবাড়ির বউ। অবশ্য 'কুললক্ষ্মীদের অনুপস্থিতিতে' আরতি আরম্ভ করা যেত না, সেকথাও বলা হয়েছে। তবুও সেখানে ছিল কত নিয়ম, কত রীত : ''কাল অষ্টমী লাগবে, সাথে সাথে যে ভরার বাতি জ্বালতে হবে, মনে আছে ত! পিতিমার পেছনে বড় মাটির পাতিলের মধ্যে বড় পিদিপে নতুন কাপড়ের মোটা সলতের পিদিপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। দশমীর সন্ধ্যে অবধি তেল-সলতে দিয়ে ওকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে, ভরার বাতি নেবা কিন্তু অকল্যাণ।"

এ-নিয়ম সম্ভবত বাংলাদেশের পাবনা জেলার; কেননা গিরিবালার বিবাহ হয়েছিল সেখানে। তিনি ব্যাখ্যা করেননি 'ভরা' কাকে বলে। কাজেই যখন পড়ি ''ভরা উঠিবে অন্তঃপুরের বড় ঘরের লোহার সিন্দুকের মাথায়" তখন ঠিক বুঝতে পারি না। আরও আছে : ''ভরার কাছের যাত্রা-কলসি নিয়ে যেতে হবে বরণের সময়।" দেবীবরণের সময় ''সকলে সর্বাঙ্গে গহনা পরিয়া, নূতন শাড়ি পরিয়া ঝলমল করিতে লাগিল।"

গিরিবালার কন্যা লেখিকা বাণী রায়। তাঁর উপন্যাস 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' যে-খাতেই বয়ে যাক না কেন, দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে বাণী রায় ভুলতে পারেননি নিজেদের বাড়ির পুজোর কথা : ''আমাদের বাড়ির দুর্গাপুজোর ঘটা সর্বজনবিদিত। আশ্রিতার দল বেড়ে উঠল, পুজো দেখতে এসেছে তারা। ঠাকুর দালানে চুনকলি ফেরানো হল।... কাজ, কাজ! দশ হাতে কাজ করেও তো দশভুজার কাজ ফুরোয় না।" নতুনত্ব আছে বোধনের সময় বরণের মধ্যে। ''সারাদিন ধরে বোধনের আয়োজন চলল। গঙ্গা থেকে কলাগাছকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে স্নান করিয়ে আনা হল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পূজামণ্ডপে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন হল।" এ-উপন্যাস লেখা হয়েছে অনেক পরে ১৯৬১ সালে। তবু পুজোর কথায় সেকাল এসে পড়ে।

''বরণের সময় শাশুড়ি বেগুনি একখানি বেনারসী পরতেন—সারা শরীরে জরির ছড় টানা। সেকালের বিশিষ্ট শাড়ি। সেই শাড়ি পরতে হল, গলায় শাশুড়ির সাতনরি হার, হাতে বাঘমুখো বালা। চন্দনজলে সুরভিত, ঝুরো মুক্তোর ঝালর-দেওয়া পাখায় ব্যজন করলাম কলাবউকে—আমি।"

শহর কলকাতায় ঘটা করে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল শোভাবাজারের রাজবাড়িতে পলাশির যুদ্ধের পরে। এই পরিবারের বধূ বিভাবতী দেব শুনেছিলেন, ''রাজা নবকৃষ্ণের মনে অনেকদিনের বাসনা ছিল দুর্গাপুজো করবার। সে সুযোগ এসে গেল ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর। ...সেবারই নবকৃষ্ণ পুজোর আয়োজন করেন এই বাঘওয়ালা শোভাবাজার রাজবাড়িতেই। সে পুজোয় খরচ হয় একলক্ষ টাকা।" ১৮০৬ সালে শরিকদের মধ্যে রাজবাড়ি ভাগ হয়ে যাওয়ার পর পুজো হচ্ছে দু-বাড়িতেই। রাধাকান্ত দেবের বংশের বধূ বারিজবাসিনী দেব বলেছেন, ''শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গোৎসবের কথা কেই বা না জানে, কিন্তু আমরা বাড়ির বউরা সকলের সামনে পুজোমণ্ডপে পুজো দিতে কিংবা দেখতে পারতাম না, পুজোর অঞ্জলি দিতে যাবার আগে বাইরের লোকজন সরিয়ে চতুর্দিকের গেট বন্ধ করে দেওয়া হত। পুজোর জায়গায় যাবার আমাদের একটি বিশেষ পথ ছিল। যাবার সময় পথটিকে আপাদমস্তক পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। এই পর্দার আড়াল দিয়ে আমরা পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দিতে ঢুকতাম। আর পুজোর আরতি কিংবা পুজোর কাণ্ডকারখানা দেখতাম ঠাকুর দালানের দোতলায় টানা লম্বা 'চালাঘরে'র চিকের আড়াল থেকে।" বেলা দে শৈশবে দেখেছিলেন রাজবাড়ির প্রতিমা ''বিশাল বড় প্রতিমা। টানা টানা চোখ। নাকে ফাঁদি

নথ। গা-ভরা গয়না। আমরা ছোটরা মাথা উঁচু করে তবে মায়ের মুখ দেখতে পেতাম।''

রাজবাড়িতে কন্যা এবং বধূরাই শুধু চিকের আড়ালে থাকতেন না, মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দশভুজা যেহেতু নারী, তাঁর সামনেও থাকত অভ্রের ঝরোকা। আবার এমন ব্যাখ্যাও আছে, দেবলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের ব্যবধান বোঝানোর জন্য সৃষ্টি করা হত অদৃশ্য আড়াল। আরও দু-একটি অভিজাত পরিবারের প্রতিমার সামনে অভ্রের ঝরোকা ব্যবহার করা হত, রাজবাড়ির পরে।

ভেবেছিলাম মহিলাদের রচনায় দুর্গাপুজোর কথা কমই থাকবে। কেন না শিক্ষিতা মহিলারা, যাঁরা লেখার জন্য কলম ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মিকা। হিন্দু মহিলারা গল্প উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের নানারকম সমস্যা নিয়ে, সে-সমস্যাও বড় কম ছিল না। সেজন্যই তো দেবী দুর্গা হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের ঘরের মেয়ে, তিনটি দিনের ছুটি পেয়ে পুত্রকন্যাদের নিয়ে বাপের বাড়িতে আসা এবং কেঁদে-কাঁদিয়ে আবার শিবলোকে ফিরে যাওয়া। আশ্বিন মাসে কাশফুল ফুটতে না ফুটতেই গ্রামে পাড়ায় শোনা যেত ভিখারি বৈষ্ণবদের আগমনী গান, নবমী নিশি না পোহাতেই বিজয়ার গান—সে-গান শুধু ভিখারির কণ্ঠে নয়, সদ্য প্রকাশিত গ্রামাফোন রেকর্ডে, বাবুদের বৈঠকখানায় বিজয়া সম্মিলনীতেও শোনা যেত। সকলের চোখ যে সজল হয়ে উঠত সে তো শুধু দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের কথা ভেবে নয়, পরের ঘরে পাঠানো নিজের মেয়েটির জন্যেও। আশাপূর্ণা দেবীর মনে হয়েছে, ''দুর্গাপুজো বাঙালিচিত্তের সত্তার গভীরে লালিত একটি সুষমাময় ভালবাসা।'' কাজেই মেয়েদের আত্মস্মৃতির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে পুজোর কথা, পুজো মানেই দুর্গাপুজো, এর সঙ্গে জড়িয়ে আরও দুটি শব্দ পুজোর ছুটি ও পুজোর উপহার। পুজোর ছুটি শুধু মা দুর্গারই হয় না, এই ছুটিতে বাড়ি আসেন প্রবাসী পুরুষেরা। বাড়ির সবাই তাঁদের পথ চেয়ে থাকেন। তাঁরা নিয়ে আসেন নানারকম পুজোর উপহার। আরও পরে শহরবাসী সম্পন্ন পরিবার গ্রামের বাড়িতে আসেন পুজোর সময়। পিতামাতার সঙ্গে শিশুরা পুজোর ছুটি উপভোগ করত। শিশুমনে দাগ কেটেছে কত ঘটনা। বড় হয়ে তাঁরাই কলম ধরেছেন যখন, তখন আমরা পাই বিভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পুজোর গল্প। কোথাও সেগুলি একরকম, কোথাও একেবারে আলাদা। বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গের, অধুনা বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের কথা। আজ দেশ-কালের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পুজোর স্মৃতি শরৎকালের শিউলি ফুলের মতোই অমলিন।

রানি চন্দ লিখেছেন 'আমার মায়ের বাপের বাড়ি'। ''দেখতে দেখতে পুজো এসে পড়ে। মামারা যাঁরা বিদেশে আছেন চলে আসেন দেশে। আজ একজন এসে পৌঁছালেন, কাল একজন। প্রতি বাড়িতে নিত্যনতুনের আগমনের আহ্লাদ।... এই আসাটাই দেখতে আনন্দ।... মামারা এসেছেন—কত রকমের নতুন জিনিস এনেছেন কলকাতা থেকে।... গাঁটরি খোলা হবে, ঘিরে বসে থাকি দেখতে... নতুন শাড়ির সৌরভই আলাদা—যেন পুজো পুজো গন্ধ মাখা।... নন্দীদের দুর্গামণ্ডপে প্রতিমা গড়া হচ্ছে—কুমোর এসেছে ভিন গাঁ থেকে। খড় বাঁধা হল, খড়ের ওপর মাটি দেওয়া হল। এবার রং হচ্ছে, সাজ হচ্ছে, ছুটে ছুটে গিয়ে দেখি।

''ষষ্ঠীর আগের দিন রাত্রে গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে 'চক্ষুদান' হবে। এইটিই শেষ কাজ প্রতিমা গড়ায়। চক্ষুদান হয়ে গেলে কুমোর আর হাত দেবে না প্রতিমায়।... কুমোর কালো রঙে তুলি মাখিয়ে ভুরু টানলো, চোখের রেখা টানলো, পরে চোখের ভিতরে কালো মণিটি বসিয়ে দিল। দেবী জ্বলজ্বল করে দুচোখ মেলে চাইলেন।

''মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন।''

কলকাতার পুজো শৈশবে দেখেছিলেন উষারানি মুখোপাধ্যায়। ফরিদপুরের নড়িয়া গ্রামে তাঁদের বাড়ি ছিল। কর্মসূত্রে পিতা থাকতেন চাঁদপুরে, সেখানে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হত না বলে কলকাতায় সিস্টার নিবেদিতার স্কুল বোর্ডিং-এ ভর্তি হলেন চার বোন। উষারানির বয়স তখন মাত্র চার বছর : ''আমি... স্কুলেই তেঁতুল বিচি দিয়ে অ, আ, ক, খ শিখেছি।'' তিনি স্কুলে ছিলেন তিন বছর—১৯১৮ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত। দুর্গাপুজোর সঙ্গে মিশে আছে সেসময়কার স্মৃতি—''ছুটির দিনে... গঙ্গাস্নানের পর আমরা বাগবাজারের রামকৃষ্ণ উদ্বোধন অফিস মঠে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে যেতাম, তিনি আমাদের সবাইকে আদর করতেন।''

উষা লিখেছেন, ''আমার মনে পড়ে সিস্টার নিবেদিতার স্কুলে যখন পড়তাম তখন পুজোর সময় বাড়ি যেতাম না, বোর্ডিং-এই থেকেছি। তখনও বারোয়ারি পুজো আরম্ভ হয়নি, পুজোর সময় আমাদের বাগবাজারের অনেক বাড়ির ঠাকুর দেখিয়ে আনা হত। ঠাকুর খুব বড় হত না। ঠাকুর দালানে পুজো হত। এখনকার মতো কোথাও প্যান্ডেল দেখিনি। ঠাকুর দেখে আমরা খুবই আনন্দ পেতাম।''

সমকালের আর একটি বাড়ির কথা বলি। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এক বৈদিক ব্রাহ্মণকে গুরুরূপে গ্রহণ করে প্রতিমাপুজো বর্জন করেছিলেন। বাড়িতে বৈদিক বিধানে হোম হত শুধু। তাঁর পুত্রবধূ প্রকৃতি কয়লাহাটা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে। তাঁর মেয়ে সুরভি ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''আমার মায়ের মামার নাম জগদীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হত বছরে মাত্র একটি দিন। সে-দিনটি বিজয়া দশমীর পরদিন। মা ছেলেমেয়েকে নিয়ে যেতেন প্রণাম করতে।... একদিন আমি মাকে বললুম, 'মা তুমি তো পাথুরিয়াঘাটা আর কয়লাহাটায় বিজয়ার প্রণাম করতে যাবার অনুমতি পেয়েছ। একদিন আগে গেলে তো দশমী পূজার প্রতিমাবরণ দেখতে পাবে।' এই দুই বাড়িতেই মহা ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে বহুদিন ধরে। মা বললেন, 'তা হয় না। এতে আমার শ্বশুরমশাইকে অপমান করা হবে। তিনি যা পছন্দ করেন না, এই বাড়ির বউ হয়ে সেটা কি আমি করতে পারি?' ''

বিজয়া-দশমীর প্রতিমাবরণ একসময়ে মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। সেকালে গৃহিণীরা কন্যা, বধূ সকলকে নিয়ে বরণ করতে আসতেন। এই দিনটিতে তাঁরা সকলেই পরতেন দামি নতুন শাড়ি, প্রচুর গয়না। বরিশালের বধূ শোভা ঘোষ লিখছেন, ''আগেই ঠাকুরমায়েরা বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে সকালবেলা উঠিয়াই কোনদিকে না তাকাইয়া একেবারে উঠানে আসিয়া মণ্ডপের সামনে রাখা দই আর মাছের দিকে দেখিতে হইবে। এই দেখিয়া তবে অন্য কাজ। আজ দশমী।'' এই একই নিয়মের কথা বিক্রমপুর-সোনারঙের মেয়ে মালতী সেনগুপ্ত লিখেছেন, ''বিজয়ার দিন বড় পুকুরের ধারে সব ঠাকুর আনা হত। মেয়েরাও ছোট ছোট নৌকায় আসত। বিসর্জনে ঢাকের বাজনা, আরতি, বাজি পোড়ানো সব হত নৌকায়। শেষে বাড়ি ফিরে শান্তিজল নেওয়া। পরদিন গোয়ালা এক ভাঁড় দই দিয়ে যেত। আর জেলেরা দিত পুঁটি মাছ। সকালে এসব দেখে যে দিন শুরু করে, তার সে বছরের যেকোনও যাত্রা শুভ হয়।'' এখানে প্রশ্ন, দই-মাছ দেখা হয় কবে? বিজয়ার দিন, না পরের দিন? কিংবা দুই অঞ্চলের দুই নিয়ম ছিল।

ফিরে আসি শোভার কথায়। বিজয়া দশমীর প্রতিমাবরণের কথায়। মালখাঁনগরের বসুঠাকুর পরিবারের কন্যা তিনি। লিখেছেন, ''এর পরে একটি মস্ত বড় স্ত্রী-আচার আমাদের হইয়া থাকে। খুব

সকালেই সব সধবা আর অবিবাহিতা মেয়েদের সকলকে যত ভাল শাড়ি আর গহনা পরিধান করিয়া মণ্ডপে আসিয়া জমায়েত হইতে হয়। আমাদের বাড়িতে বট্‌ঠাকুরমা লাল পাড় গরদ পরিয়া হাতে বরণকুলা লইয়া সর্বপ্রথম মণ্ডপে উঠিলেন। বট্‌ঠাকুরমা বাড়ির সবচাইতে বড় এবং সধবা, তাই তাঁর মান সকলের উপরে। তাঁর পিছন পিছন আসিলেন বড় ছোট হিসাবে অন্যান্য ঠাকুরমায়েরা। মা, কাকীমায়েরা, পিসিমায়েরা কেউ শাঁখ হাতে, কেউ ঘট হাতে, কেউ পাখা বা দীপ হাতে, কাহারও বা হাতে থালা ভরা মিষ্টি ও পান, ধান-দূর্বা, ধূপ, প্রদীপ, সিন্দুর-কৌটা ইত্যাদি। আমরা নাতনিরা পাশে পাশে আছি, কি করা হয় সব দেখিতেছি। প্রথমে বট্‌ঠাকুরমা, পরে অন্য সকলে তখন একটা বড় চৌকির উপর দাঁড়াইয়া মাকে বরণ করিতে লাগিলেন। বরণ শেষ হইলে, মায়ের মুখে, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, এমনকি অসুর, সিংহ ও নেংটি ইঁদুরটিকে পর্যন্ত মিষ্টি দিয়া সংবর্ধনা করা হইল। তারপর মায়ের মুখখানা আঁচল দিয়া মুছাইয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে বট্‌ঠাকুরমা সর্বপ্রথমে চৌকি হইতে নামিলেন, তারপর পায়ে ধান-দূর্বা দিয়া ও সিন্দুরের কৌটা স্পর্শ করাইয়া মাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন, তারপর সকলকে লইয়া প্রতিমার দিকে মুখ করিয়া ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া মণ্ডপ হইতে সকলে নামিয়া আসিলেন।... সবাই অনেক গহনা পরিয়াছেন, সকলেরই পরিধানে বেনারসী শাড়ি।" ঠিক যেন প্রত্যক্ষদর্শীর ধারাবিবরণী। এ-সময়ে শোভারও বয়স দশ-এগারো বছর। মনে হয়, অধিকাংশ বাড়িতেই এ-ধরনের প্রতিমা-বরণ হত।

নারায়ণগঞ্জের বাসন্তী গুহঠাকুরতা লিখেছেন, ''বিকেলে আয়তিরা প্রতিমাকে ছুঁয়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গাকে সিঁদুর পরায়। এক বোঁটাতে দুটি করে পান ঝুলিয়ে দেন দুর্গার দশ হাতে, লক্ষ্মী-সরস্বতীর দুহাতে। মা-কাকিমারা যেন মেয়েকে এক বছরের জন্য স্বামীর বাড়ি পাঠাচ্ছেন —তাঁরা কাঁদতেন। মায়ের অঝোরে কান্না দেখে আমারও কান্না পেত।" বাসন্তী দুর্গাপুজোর আর একটি অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন, ''দুর্গাপূজার তিন দিন দুর্গাদেবীকে স্নান করানোর ঘটা কি! একশত আট পদ দিয়ে দুর্গাকে স্নান করাতে হয়। সোনা, রূপা থেকে চুন পর্যন্ত। পাশের ঘরে একজন পুরুত ঠাকুর চণ্ডীপাঠ করে যান, বড় মণ্ডপে এক হাঁড়ি জলের মধ্যে প্রধান পুরুত মন্ত্র পড়ে ওইসব বস্তু ঘটের জলে ফেলেন বা ছোঁয়ান... তার পরের ব্যাপারটা খুব সহজ। পুরুতমশাই আমের পল্লব দিয়ে ঘড়ার সেই মন্ত্রপূত জল সকল দেবদেবীর গায়ে ছিটিয়ে দেন।" তবে সময় বদলাচ্ছিল। আগমনীর বদলে বাসন্তীর দাদা গেয়ে উঠতেন, 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।' ''কী সুন্দর সে গানের কলি! কথা যেন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেত।"

মানসী দাশগুপ্ত 'কম বয়সের আমি' লেখার সময় দু-জায়গায় পুজো দেখার কথা লিখেছেন। বহরমপুরে ও দাদুপুরে। দ্বিতীয়টির কথায় লিখেছেন, ''সেখানে পুজোয় সিদ্ধেশ্বরীতলার সাজ, দেবীবরণ, তারপরে সন্ধিপুজোয় বলির পাঁঠার আর্তনাদে দিদির একেবারে সাদা হয়ে পালিয়ে যাওয়া—অন্যরকম, সেসব অন্যরকম।" প্রসঙ্গত বলে রাখি, যতগুলি দুর্গাপুজোর কথা মহিলারা লিখেছেন প্রায় সব কটিতেই বলির কথা আছে, কোথাও ছাগবলি, কোথাও মহিষবলি। সর্বত্র তাঁরা কেঁপেছেন, দুঃখ পেয়েছেন, ভয় পেয়েছেন, শিউরে উঠেছেন। বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোয় স্বামী বিবেকানন্দের বলিদানের সংকল্প শুনে শ্রীমা যেমন নিষেধ করেছিলেন। মায়ের কন্যাদের মধ্যেও ছিল সেই একই শিহরন, একই যন্ত্রণা। তাঁরা সকলেই যে মায়ের মেয়ে! হেমন্তবালা দেবী এ-প্রথার রীতিমতো সমালোচনা করে লিখেছেন, ''এই

জিনিসটি মনুষ্যত্ব তথা ধর্মভাবের বিপরীত। অথচ যুগযুগান্ত ধরে এই যে কুপ্রথা চলে আসছে এর বিরুদ্ধে তখন ওই সংসারে একমাত্র আমার মা ছাড়া আর কাউকে দাঁড়াতে দেখিনি।" হেমন্তবালার জননী গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্ত্রী অনন্তবালা দেবী। তাঁর কথা তাঁর কন্যার স্মৃতিকথা থেকেই জানা যায় : ''আমার মা শাক্ত-কন্যা, শাক্ত-বধূ, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও সাত্ত্বিক নিরামিষ উপকরণে পূজা করতেন। একবার পুত্রকামনায় তিনি স্বতন্ত্রভাবে একটি ছোট প্রতিমা এনে পূজা করান, সে পূজায় কুষ্মাণ্ড বলি দেওয়া হয়েছিল।" হেমন্তবালা জীববলি দেখতে পারতেন না। দেখতেন ''বাবাকে হোলিখেলার মতো রক্ত মাখিয়ে দিত।" তিনি লিখেছেন, ''আমিষাহারে অপ্রবৃত্তি তখন ছিল না। লোভ যে ছিল না তাও নয়। কিন্তু জীবহিংসা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারিনি, এইসব দ্বন্দ্বের ফলে ১৭ বছর বয়স পূর্ণ হলে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হতে চেষ্টা করি এবং কৃতকার্য হই।"

বহরমপুরের দুর্গাপুজোর কোনও বর্ণনা মানসী দেননি। সমকালীন একটি ছবি এঁকে দিয়েছেন বইয়ের পাতায় : ''বহরমপুরে পুজোর কাপড় নিয়েই কত কথা। কোনওদিন নববস্ত্র ছাড়া চলে না, তাই বলে মিলের কোরা কাপড় পরতে আছে না কি? ধেৎ! ভালো তাঁত পরতে হবে। অষ্টমীতে সবচেয়ে ভালো যেটা আছে সেটা পরলে আর অন্যদিন একেবারে নতুন না পরলেও চলে। একটু পুরনো হলেও বাহারে কাপড় পরলেই চলে। মণ্ডপে সময় কাটাতে একটুও ভালো লাগেনি আমার।" তা না লাগলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা যে স্বাধীনতা অর্জন করছেন, সেকথা ভুলে গেলে চলবে না। আগে যাঁরা চিকের আড়াল থেকে বাড়ির পুজো দেখতেন, আত্মীয়দের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে নিজেকে সোনায় মুড়ে, জরি পাড়ের দামি শাড়ি পরে পালকি চেপে যেতেন, সেই দিনগুলো হারাতে শুরু করেছে। তবু মানসীর মা বলতেন, ''মণ্ডপ থেকে ঠাকুর চলে গেল, হয়ে গেল। ঘাটে বাচ যাওয়া কি ভদ্রঘরের মেয়েদের কাজ?"

মেয়েরা অবশ্য সেখানেই থামেননি। হেনা দাস 'চারপুরুষের কাহিনী'তে লিখেছেন নরপতি গ্রামের দুর্গাপুজোর কথা। তখন পুজোর আকর্ষণ বলতে 'পুজোর গল্প বা কবিতার বই' ছাড়াও এসে গিয়েছে কলের গান বা গ্রামাফোন। গিরিবালার 'রায়বাড়ি' উপন্যাসেও শহর থেকে কলের গান নিয়ে আসার প্রসঙ্গ আছে। হেনা লিখছেন, ''আমরা সিলেট থেকে আমাদের গ্রামাফোন নিয়ে যেতাম। সেই গ্রামাফোন আমাদের বাড়িতে প্রকাণ্ড উঠোনে টেবিলের ওপর বসিয়ে রেকর্ড বাজানো হত। সেই উঠোনে গান শোনার জন্য বাচ্চাবুড়ো সবাই দারুণ বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে ভিড় জমাতেন। যিনি গান করছেন তিনি কোথায়, তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কেন?" পুজোর সময় অবশ্য চণ্ডীর গান, যাত্রা, বাইনাচ প্রভৃতিও হত। মহিলাদের লেখায় তার উল্লেখ নেই তা নয় তবে পুজোর সময় ধুনুচি নাচ ও আরতির কথাই বেশি ছিল। প্রতিভা বসু 'জীবনের জলছবি'তে লিখেছেন, ''বিক্রমপুর পরগণার সবচেয়ে নামী ঢাকি ল্যাংড়া বাদ্যকর। ঠাকুরমশায়ের আরতি শেষ হলে মণ্ডপের বাইরে মস্ত আঙিনায় নির্দিষ্ট ল্যাপা জায়গায় ধুনুচি ধরতো বোঁচার মায়ের ছেলে বোঁচা।... বোঁচার আরতি দেখার জন্য সারা গ্রাম ভেঙে পড়ত, বাবা কাকা, দাদুরা উৎসুক হয়ে বৈঠকখানা ঘরের সামনে চেয়ার পেতে বসতেন। বোঁচা দুই হাতে দুই ধুনুচি নিয়ে মণ্ডপের মাটিতে প্রণাম করে শুরু করত আরতি।... বোঁচা প্রণামের ভঙ্গিতেও নাচ আনতো। ধুনুচি নিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতেও নাচ থাকত। তারপর মৃদু মৃদু পা ফেলে আরম্ভ করত আরতি। যেন গানের আলাপ। আস্তে আস্তে বেজে উঠত তাল। তালে তালে ল্যাংড়া বাদ্যকরের চাঁটি বেড়ে যেত। যেমন বাজনা তেমনি

নাচ। বোদ্ধা অবোদ্ধা সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখত, শুনত। সেই নাচ একসময়ে যখন সেতারের ঝালার কাজের মতো দ্রুত লয় হয়ে একেবারে শীর্ষে উঠত, ঢাকিও খোঁড়া পা নিয়ে নেচে নেচে এমন দ্রুত কাঠি দিত ঢাকে যে নাচের ছন্দ আর ঢাকের ছন্দ একাত্ম হয়ে প্রত্যেকের চৈতন্যে একটা দুর্লভ অনুভূতির সৃষ্টি করত। একসময় বোঁচা দুই ধুনুচিভরা আগুন নিয়ে সংবিৎহারা হয়ে পড়ে যেত মাটিতে, ধুনুচির আগুন তার মাথায় মুখে হাতে সর্বত্র ছড়িয়ে যেত। লোকজনেরা আগুন সরিয়ে মাথায় জল ঢেলে জ্ঞান ফেরাত।"

নরপতি গ্রামের ''বিশ্বাসবাড়ির প্রগতিবাদী ছেলেমেয়েরা গ্রামে একটা বিপ্লব সাধন করেছিলেন, প্রতি পুজোয় ছেলেমেয়েদের একত্রে অভিনীত নাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা অভিনয় করবে (হোক না তারা ভাইবোন) সেটা তখনকার দিনে ভাবাই যেত না।"—লিখেছেন হেনা। তাঁদের বৃহৎ পরিবারে অনেক ভাইবোন। হেনার সবচেয়ে বড় দাদা ছিলেন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী (স্বামী শান্তিময়ানন্দ)। তাঁর সাধু হওয়ার গল্প শুনিয়েছেন হেনা : ''১৯১৯ সালে দাদা ম্যাট্রিক পাশ করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করায় মা খুশি হয়ে তাঁকে একটি আংটি দিতে চাইলেন। দাদা আংটির বদলে টাকা দেওয়ার জন্য মায়ের কাছে বায়না ধরলেন। মা বিনা আপত্তিতে খুশি মনেই দাদাকে টাকা দিলেন। সেই টাকা নিয়ে দাদা কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন কামারপুকুর, জয়রামবাটীতে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী স্বনামধন্যা মা সারদাদেবীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সাধারণ সংসারীদের দীক্ষা নয়, সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর দীক্ষা তিনি নিলেন।... নাম হল ব্রহ্মচারী আত্মচৈতন্য।" হেনার অন্যান্য দাদারা জড়িত ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে। হেনাও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। তিনি লিখেছেন, ''নরপতি বাড়িতে আমার অগ্রজ দাদারা এক পুজোর ছুটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।... কোনও গ্রামে কোনও পরিবারের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।"

দিন বদলাচ্ছিল। সরলা ঘোষাল একটা জাতীয় উৎসবের দিন খুঁজছিলেন : ''যেমন রামলীলা ও দশেরা বা বিজয়া দশমীর দিন বঙ্গেতর হিন্দু-ভারতে বীরোচিত নানা খেলাধূলা চলে, বাংলায় সেইরকম চালাতে হবে—কোন দিন?... পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে চোখে পড়ে গেল দুর্গাপূজার অষ্টমীর আর একটি নাম বীরাষ্টমী এবং সেদিন বীরাষ্টমী ব্রত পালন করা ও ব্রতকথা শোনানোর বিধান।... যা চাচ্ছিলুম পেয়ে গেলুম। বহুকাল ধরে বাংলাদেশের সংস্কারে যা রয়েছে কিন্তু বাঙালির ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে তারই পুনরুদ্ধার করা।... সেই থেকে আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা হল।"

আশাপূর্ণা দেবীর ছেলেবেলায় কলকাতার মতো শহরেও সার্বজনীন পুজো বলে কিছু ছিল না : 'পুজো বলতে যা কিছু বনেদি বাড়ির ঠাকুরদালানে'—লিখেছেন আশাপূর্ণা, ''অবশ্য বারোয়ারি পুজো বলে একটা ব্যাপার ছিল। নাকি কোথাকার গঙ্গারঘাটে হত সে পুজো। সেখানে গিন্নিবান্নিরা অঞ্জলি দিয়ে আসতেন একেবারে গঙ্গাস্নান সেরে।... প্রথম সার্বজনীন পুজো হয় বোধহয় বাগবাজারে।" তাঁর মনে হয়েছে ''দুর্গা প্রতিমায় চলছে আর্টের খেলা। চিন্তাভাবনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিব ঠাকুরের একান্নবর্তী পরিবারটির চেহারায় ভাঙন।... আমার তো স্থির বিশ্বাস যবে থেকে ওই আর্টের খাতিরে ভোলানাথের পরিবারের চিরকালীন আস্ত চেহারাটিতে ভাঙন ধরানো হয়েছে, তবে থেকে আমাদের এই মানব পরিবারেও ভাঙন ধরেছে।"

রাজলক্ষ্মী দেবীর 'লাজুকলতা' উপন্যাস হলেও লেখিকার পরিচিত পরিবেশটি বেশ খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৪৬-এর নৃশংস হত্যালীলা, নির্বিচার লুণ্ঠন, ভয়ংকর মারামারির পরে যখন দুর্গাপুজো এল তখনকার কথা। রাজলক্ষ্মী লিখেছেন, ''১৯৪৬ সালের শারদীয়া দুর্গাপূজাতে অসুরকে খুব জবরদস্ত সাজ দেওয়া হয়েছিল। ...সব প্রতিমাকেই ভক্তিভরে প্রণাম ঠুকতাম আমরা। সেবছর লক্ষ করেছিলাম, সবগুলি প্রতিমাতেই অসুরটাকে যেন খুব বেশি ভয়ংকর বানানো হয়েছে। মূর্তিশিল্পীরা হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতে সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির মধ্যেকার রূপকে অসুরের চেহারায় ফুটিয়ে তুলেছে। এমন তো হবেই। চেয়ে দেখ্ মা দুর্গাকেও বেশ রাগী রাগী দেখতে লাগছে। সত্যিকারের মহিষমর্দিনী চেহারা।''

নবনীতা দেবসেনের আধুনিক পুজো আর ভাল লাগছে না। লিখেছেন, ''পুজোয় আমি আগের মতো শহর চষে ফেলে ঠাকুর দেখা পছন্দ করি না। সত্যিই বড্ড ভিড় আর বড্ড থিম। এত থিম আর আমার সহ্য হয় না। মা দুর্গার তো একটাই থিম—মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, অশুভদলনী; তাঁর বাপের বাড়িতে আসছেন।''

আমাদের সংসারে একদিন মেয়ে ছিল অবাঞ্ছিতা, তাকে ঘর থেকে বিদায় করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা হত। অধিকাংশ মেয়ে আর কোনও দিন ফিরত না মায়ের কাছে। তার প্রতিবাদেই নিরুপায় জননী একদিন জগজ্জননীকে কন্যা কল্পনা করে নিয়ে পুরুষের গড়া নিয়মের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, দুর্গাপুজো তারই স্মৃতি। এ-পুজো ঘরের মেয়েকে তার নিজের ঘরেই প্রতিষ্ঠা করার উৎসব। ভগবতী চণ্ডিকার স্তুতিতে ঋষিগণ বলেছেন, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—জগতে যেখানে যত নারীমূর্তি আছে, তা মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ। একথা মনে রেখেই দেবী আসছেন ঘরের মেয়ে হয়ে প্রতি বছর; মেয়েরা তা ভুলবেন কেমন করে? তাঁদের লেখায়, আয়োজনে, শিল্পকলায়, সৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যাবে দুর্গাপুজোর কথা।

## সহায়ক গ্রন্থ


১। *সরলাবালা সরকার রচনাসংগ্রহ*, খণ্ড ১, *হারানো অতীত : কাঁঠালপোতার বাড়ি*, *স্মৃতির দূরবীক্ষণ : সেকালের দুর্গোৎসব*

২। সৌদামিনী দেবী, *পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা*

৩। বিভাবতী দেব, *সাক্ষাৎকার* (আনন্দবাজার পত্রিকা, ক্রোড়পত্র, ১৯৮৫)

৪। বারিজবাসিনী দেব—*সাক্ষাৎকার* (প্রতিদিন, বনেদিবাড়ির অন্তঃপুর, ১৯৯৩)

৫। বেলা দে, *আমার জীবন আমার আকাশবাণী*, অনুলিখন হেনা চৌধুরী

৬। আশাপূর্ণা দেবী, *আরেক আশাপূর্ণা : দুর্গোৎসব সেকাল একাল*

৭। রানি চন্দ, *আমার মায়ের বাপের বাড়ি*

৮। উষারানি মুখোপাধ্যায়, *সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি*

৯। সুরভি ভট্টাচার্য, *নানা রঙের দিনগুলি*

১০। শোভা ঘোষ, *আজও তারা পিছু ডাকে*

১১। মালতী সেনগুপ্ত, *দুই মায়ের গল্প—সন্ধ্যাবেলার দিনগুলি*

১২। বাসন্তী গুহঠাকুরতা, *কালের ভেলায়*

১৩। হেমন্তবালা দেবী, *রচনা সংকলন—পুরানো দিনের কথা*

১৪। হেনা দাস, *চার পুরুষের কাহিনি*, পৃঃ ৪০, ৭৯-৮০

১৫। সরলা দেবী চৌধুরানি, *জীবনের ঝরা পাতা*, পৃঃ ১৪০-৪২

১৬। নবনীতা দেবসেন—*নবনীতার নোট বই*, পৃঃ ৯৮

১৭। চৈতন্যময় নন্দ, *দশভুজার মহাপুজো*, সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪